Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 1-13
ISSN 2309-0898

সমর সেনের কবিসত্তা ও সমাজমানস

সৈয়দ তৌফিক জুহরী*

Abstract

Samar Sen, a Marxist poet and progressive activist, tried to build a new poetic movement. He also tried to point out the inequality of capitalist society, economic oppression and inhuman deprivation in his poetry. As an intellectual poet, he controlled his emotion and passion and dispassionately wrote about the socio-economic and political realities of India. He observed the sufferings of common people, hunger, and other crisis of the poorer section of people and became a citizen poet but Marxist in thought. This paper is an attempt to find out how he became a poet of intellect and with the force of emotions and excitement how he tried to unveil intellectual power.

বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার নষ্টরূপ, অন্যায়-অবিচারে একশ্রেণির সুবিধাভোগীর স্ফীতকায় দেহ, প্রতিকারহীন দুর্বিপাক এবং কষ্ট-পীড়নের গ্রন্থিলতা এক অসহায় আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিস্বরূপ সৃষ্টি করে। এইব্যক্তিস্বরূপ যখন কালজয়ী কবি-আত্মাকে নীরবে বহন করে, তখন এর সাথে নবতর আঙ্গিকসমৃদ্ধি ও কল্পনাঋদ্ধির শুদ্ধি-অভিযান পরিচালিত হয়। সুতরাং কবি ও তাঁর কবিতাকে অনুধাবন করতে একদিকে যেমন সমকালীন সমাজের মূর্ত কিন্তু অনাহত রূপ এবং ধ্বংসশীল বস্তুপৃথিবীকে বিবেচনায় আনতে হয়; অন্যদিকে তেমনই কবির বৈদগ্ধ ও প্রজ্ঞার বিশুদ্ধতাকেও একস্থানে স্থির করা আবশ্যক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সমর সেনকে (১৯১৬-১৯৮৭) আধুনিক, অথচ জনবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিকধারার আত্মিকসংকট ও বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তার নানাবিধ ক্ষয়কে পরিস্রবণ করতে হয় জীবনজিজ্ঞাসার অন্তহীন কৌতূহলে। যদিও সাহিত্যশিল্পের সমস্ত-বিষয় সমাজের পরিস্রুত অধঃক্ষেপ কিংবা জারক-বিজারক নয়, তথাপি কোন-না-কোনভাবে তা আবহমান দেশ-কাল-প্রতিবেশকে বিজড়িত করে রাখে চমকিত মুখচ্ছদে। সুতরাং সময়-সমাজের ধ্বংসশীল চক্রক্রমেও কবিকে উত্তীর্ণ হতে হয় পরিবর্তনের নঞর্থক-বাস্তবতায়, সচেতনে-অবচেতনে এবং ঘটাতে হয় নতুন বোধের উন্মোচন। এ-ধারায় কবি সমর সেন পরিস্ফুটনের বিশেষ স্তরে উপনিত হয়েছেন সমাজের অন্ধকার বর্ণপটে মধ্যবিত্তসুলভ রূপচ্ছবির উজ্জ্বলতায় ও সেই আত্মবিরুদ্ধ ব্যক্তিতার পরিস্রুত অধঃক্ষেপে। এর সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯)-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে, যখন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির প্রত্যয়শিখা ভারতীয় শিক্ষিত তরুণদের অন্তরে আলো জ্বালতে শুরু করে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মার্কসবাদ চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় এবং এতে সংযুক্ত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব মানবতাবাদ। যে মানবতাবাদের উদ্বোধন মূলত ঘটেছিল রেনেসাঁসের মাধ্যমে। তখনও সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের ব্যাখ্যাসম্বলিত প্রামাণ্য কোনও গ্রন্থ তখনও রচিত হয়নি। বিশ্বযুদ্ধের নৈরাশ্য, শূন্যতা ও বিষাদের মাঝে নতুন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে এলো রুশ বিপ্লব (১৯১৭)– বুনে দিল সম্ভাবনাময়, আশাবাদী, সমতাপূর্ণ জীবনের স্বপ্নবীজ। জন্ম নিল কাজী নজরুল ইসলামের *নবযুগ* (১৯২০) এবং *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকা দুটি। *ধূমকেতু* পত্রিকা প্রকাশের পরের বছর, অর্থাৎ ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকারও আবির্ভাব ঘটল। আর নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা পুরোপুরি প্রকাশিত হল *লাঙ্গল* (১৯২৫) পত্রিকার মাধ্যমে। এই একই সালে গড়ে উঠল *ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি* (১৯২৫) এবং সমকালীন পত্রপত্রিকায় মার্কসীয় মতবাদ নিয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনা

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫, ই-মেইলঃ staufiq999@ru.ac.bd

প্রকাশিত হল। *কালি কলম*(১৯২৬), *প্রগতি*(১৯২৭), *পরিচয়*(১৯৩১) প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলা কবিতার পালাবদল চিত্রিত হতে শুরু করল। এরই মধ্যে টি.এস. এলিয়টের *The Waste Land* (১৯২২) বিশ্বোযুদ্ধোত্তর অনুর্বর, শূন্য, পোড়া ও কঙ্কালসার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হল। এর ফলে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ কবি আধুনিক ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কাব্যদেহ গড়লেন। কবি জীবনানন্দ দাশ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রসাঁর ও ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঙর্থক মনন-বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।'[১] তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে একদিকে সরিয়ে রেখে তাঁরা চিত্রিত করলেন অবক্ষয়পীড়িত নগরের চিত্র। এরই মধ্যে ১৯৩৬ সালে প্রগতিশীল লেখক-কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ একত্রিত হয়ে গঠন করলেন *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ*। মেনিফিস্টোতে সুচিহ্নিত করা হল লেখনীর মধ্যমে প্রগতিচেতনাকে ধারণ করার প্রত্যয়। লেখকদেরকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হতেও উদ্বুদ্ধ করা হল:

> We believe that the new literature of India must deal with the basic problems of our existence today- The problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection. All that drags us down to passivity inaction and un-reason we reject as reactionary. All that arouses in us the critical spirit, which examines institutions and customs in the light of reason, which helps us to act, to organize ourselves, to transform we accept as progressive.[২]

এরই ধারাবাহিকতায় *প্রগতি লেখক সংঘ* তাঁদের প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস *প্রগতি* প্রকাশ করে ১৯৩৭ সালে। *প্রগতি* পত্রিকার মূলসুরে ধ্বনিত হয় মেনিফিস্টোর কথাগুলো। মার্কসবাদী লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এই আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান করে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৮২), মনীন্দ্রনাথ রায় (১৯১৯-২০০৩), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সমর সেন প্রমুখ। অরুণ মিত্রের কাব্যগ্রন্থে ফ্যাসিস্টবিরোধী ও সাম্যবাদীচেতনার প্রকাশ দেখা যায় । তাঁর কবিতায় জন-মুক্তির ভাবনা, সাধারণ মানুষের দুর্দশা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, নিরন্ন মানুষ প্রভৃতি এসেছে স্বাভাবিকভাবে। মনীন্দ্রনাথ রায়ের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বুর্জোয়া ক্লেদাক্ত প্রেম, মধ্যবিত্ত জীবন, ধনতান্ত্রিক সমাজের অসাম্য, অর্থনৈতিক নিপীড়ন, অমানবিক বঞ্চনা প্রভৃতি। এছাড়া পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার বৈপ্লবিক চিন্তাও লক্ষ করা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটল সাম্যবাদের পদাতিক কবিরূপে। কবি ও কর্মীর যৌথ-ভূমিকায় বাংলা কবিতায় তাঁর আবির্ভাব। সে-কারণে সাম্যবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-প্রত্যয় কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় অতি সহজেই দৃশ্যমান হয়। আর সমর সেনের আবির্ভাব একজন মার্কসিস্টের সাথে রোমান্টিক কবির যে বিবাদ তার বাহনে ভর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে কবিতায় ইন্দ্রিয়ঘনত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আবেগ আর উচ্ছ্বাসের চোরাস্রোতে আত্মনিমজ্জনে বাধ্য হন। ক্রমে আবেগকে কঠিনভাবে শাসন করে আত্মসংযমী, নাগরিক এবং মার্কসিস্ট কবিরূপে প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন হয়ে ক্রমেপরিণত হন মননধর্মী ও বুদ্ধিদীপ্ত কবিরূপে।

২.

আমরা জানি, সমর সেনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমকাল-সচেতনতা, আর এই প্রত্যয় তিনি অর্জন করেছেন সাম্যবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও প্রগতিশীল শিল্পী হয়ে ওঠার সংগ্রামী মনন থেকে।

সমকাল-সচেতন হবার কারণে নতুন সমাজগঠনের লক্ষ্যে কবির সক্রিয়-প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয়। এ-কারণে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে রচিত কবিতাসমূহে কবি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-বিরোধী হয়ে উঠেছেন। একদিকে যেমন চিত্রিত করেছেন নগরজীবনের অবক্ষয়চেতনা, অন্যদিকে তেমন এঁকেছেন মধ্যবিত্ত-মনের বিষাদময় চিত্রলিপি। কিন্তু ১৯৪০-১৯৪২ কালপর্বে যখন *নানাকথা* কাব্যগ্রন্থ রচনা করছেন, তিনি তখন হয়ে উঠেছেন আরও অধিক প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্টভাবে সমাজমনস্ক। কারণ সেই সময় ভারতবর্ষ এক অস্থির, উত্তাল, টালমাটাল আর ভয়াবহ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদ, জাপানি আগ্রাসন ও যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের মুখে রয়েছে ভারতবাসীর জনজীবন। সে-কারণে তিরিশের দশকের অন্তিমলগ্ন ও চল্লিশের সূচনাকালে, বিশ্বরাজনীতির জটিল পরিস্থিতিতে, অর্থনৈতিক মন্দায় সমাজজীবনের সার্বিক সংকটকে কবিতায় ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন কবি। তাছাড়া বাঙালি কবির দুই স্বভাব-প্রবণতা গীতিকবিতা ও রোমান্টিকতা থেকে তিনি সরে এসেছেন সচেতন প্রচেষ্টায়। আবার 'একেবারে শুরু থেকে 'নিষ্ক্রিয় সমাজের মুমূর্ষাকে' সমর সেন ধরতে পেরেছিলেন। এর জন্য নিজেকেও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। আত্মসচেতনতার জায়গা তাঁর মধ্যে নানাভাবে তৈরি হচ্ছিল।'[৩] কবিতা রচনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন। কারণ যে-সকল পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানকে কবি অপছন্দ করতেন, তাদের কোনও-কোনওটির সাথে যুক্ত হতে হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিকে কাজ করতে হচ্ছে জীবিকার তাগিদে। যদিও প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা সাম্প্রদায়িক কোনও পত্রিকায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, তিনি বেশিদিন টিকতে পারেননি। তবুও আত্মসচেতন সমর সেন আত্মগ্লানির বিবমিষায় ক্লান্ত হতেন। কবিতা রচনায়ও তার ছাপ পড়ল। এর ফলে যে-কয়টি বছর কবি কাব্যরচনা করেছেন সে সময়ে তাঁর কবিতা একস্থানে থেমে থাকেনি। প্রথম দিককার স্মৃতিবিধুর টান কেটে গিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ঝাঁঝালো উচ্চারণ। আমরা জানি, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ কালপর্বে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয় টালমাটাল প্রতিবেশ। 'কিন্তু ঠিক যে-অর্থে সরল প্রগতি ভাবনাকে কবিতায় দেখতে চান অনেকে, সে-অর্থে কবিতা লিখবার রুচি হয় নি তাঁর, বরং মনে হয়েছিল সেপথে আছে শুধু ভাবালুতা বা বাগাড়ম্বর।'[৪]তাছাড়া মধ্যবিত্ত গণ্ডীতে বেড়ে ওঠা সমর সেন বুদ্ধিজীবীর ভাষা-রুচিতেও কাব্যরচনায় আনাগ্রহী ছিলেন। সে-কারণে আর্থ-সমাজ ভাবনায় জারিত কবিতায় দেখা দিলো আত্মধিক্কারের বেদনাময় ভাষা। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা ঘটনাবর্তে কবির নিজের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাজনিত যন্ত্রণা হয়ে উঠল মূল প্রতিপাদ্য। কবির চেতনাকে আচ্ছন্ন করল অসহায়ত্ব, নিষ্ক্রিয়তা ও একাকিত্বে জর্জরিত সীমাহীন হাতাশার অন্ধকার। কবিতাগুলো পরিণত হল কবির বিশ্লেষণী মননের আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজের সংকীর্ণ শ্রেণি-অবস্থান থেকে উত্তরণের অস্বস্তিকর আত্মরক্ষার পন্থা। কলকাতার বাবুসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী রূপে সমর সেন সর্বদা এক দুর্মর যন্ত্রণাকে অনুভব করেছেন। কারণ পরিবেশে বিরূপ, আর এর ফলে ব্যক্তিজীবন নানামাত্রিক বিপন্নতায় আক্রান্ত। অন্যদিকে বৈশ্বিক প্রতিবেশেও উপ্ত রয়েছে নেতিবাচকতার বীজমন্ত্র। সুতরাং তাঁর কবিতায় স্থান লাভ করেছে আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার প্রচ্ছাপ। তাছাড়া 'ডিকাডেন্ট জীবন, সমাজ এবং সকল রকমের শোষণ-নিষ্পেষণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা সমর সেনের মধ্যে প্রথম থেকেই সমুন্নত ছিল। মুক্তি অর্জনের আকুতি ও আশাবাদ, কোন পথে, কাদের মাধ্যমে এই ইপ্সিতলক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমর সেনের স্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে।'[৫]এর ফলে সচেতন পাঠক কবির কাব্যসমূহ পাঠের মাধ্যমে, রেনেসাঁস-উত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষা সহজেই অনুধাবনে সক্ষম হন। যেখানে সমাজব্যবস্থার মৌলকাঠামো কিংবা উপরিকাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকট দ্বন্দ্ব এবং আর্থ-সামাজিক জটিলতাজনিত বহুমাত্রিক বিভ্রান্তি। আমরা জানি, কবি সমর সেনের ব্যক্তিজীবনও নানামাত্রিক বিপন্নতায় আক্রান্ত ছিল। যৌবনে বিমাতার কারণে সংসারচ্যুত হয়েছিলেন। একবার

সংসারত্যাগী হওয়ার পর কোনওদিনই ভালভাবে ঘরে ফিরতে পারেননি। সে কারণে কলকাতা নগরী তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে সহায়-সম্বলহীন, আত্মীয়-স্বজনবিহীন, বন্ধু-প্রেমিকাহীন বিবর্ণ ভুবন। তাই সংসারধর্মের প্রতি এক ধরনের অনীহা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। এমনকি চিঠিপত্রের ভাষায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে কবি তাঁর এই বিপন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে,'শুনেছি, সহধর্মিনীর কথাটা মনে করলেই লোকের দ্বায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সে জন্যই আমি বিয়ে করছি না। খালি খাটে শুতে প্রচণ্ড আরাম। কানের কাছে ঝামেলা আমার ভাল লাগে না, কানদুটো বড়ো কিনা। আমি 'একদম্' একলা আছি।'[৬] অবশ্য উত্তরকালে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেও এই অতলান্ত বিচ্ছিন্নতা থেকে তিনি মুক্তি পান নি। কারণ নগরীর বিবর্ণতাকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকা কষ্টকর। যেখানে রাত্রি 'আলকাতরার মতো', অথচ 'দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ' দৃশ্যমান। 'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায় আমরা এক ধূসর শহরের পটভূমিতে জ্বলন্ত চাঁদটিকে উদিত হতে দেখি। যা কেবল জোৎস্নাময়ী চাঁদের আভাস নয়, ফ্রয়েডিয় অবচেতন বাসনার প্রতীক। যার মধ্য দিয়ে কবিসৃষ্ট ব্যক্তিমনের হৃদয়সত্তারই বস্তুগ্রাহ্য রূপায়ণ ঘটে:

> হে শহর হে ধূসর শহর!
> কালিঘাট ব্রিজের উপর কখনো কি শুনতে পাও
> লম্পটের পদধ্বনি
> কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
> হে শহর হে ধূসর শহর!
> লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচ
> দশ টাকায়-কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,
> তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
> অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
> নাচে রক্তধারা
> আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
> হে শহর হে ধূসর শহর![৭]

অর্থাৎ এই ধূসর শহর বন্ধুহীন, প্রিয়জনহীন, প্রেম-মায়া-মমতাবিহীন এক বিবর্ণ ভুবন। এখানে বেঁচে থাকার কোনও প্রেরণা নেই। সবাই মদ, নারী, অর্থ আর নষ্ট আনন্দের পেছনে ছুটছে। কবি তাই শুনতে পান 'লম্পটের পদধ্বনি'। কামনার তাড়নায়, অর্থলিপ্সায় দেহ ও প্রেম বিক্রি করছে নারী। পুরুষও মাত্র 'দশ টাকায়' কিনে নিচ্ছে ক্ষণিকে আনন্দ। তখন দিগন্তে জাগ্রত 'জ্বলন্ত চাঁদ' মথিত হচ্ছে 'শাড়ি আর তাড়ির উল্লাসে'। এর ফলে ধূসর শহরে বিনাশ, মাদকাসক্তি আর ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। সুতরাং লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখরিত এই নগরী এক-অর্থে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত। তাইতো ঋজু পঙ্‌ক্তিমালায় জীবনের তিক্ত, নিষ্ঠুর ও হতাশায় আচ্ছন্ন দর্পণে দেখেছেন নিজেরই মুখ। এ-যেন নিজেরই জীবন-দর্পণ থেকে সমাজ-দর্পণের চিত্র উন্মোচনের প্রচেষ্টা। প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্নতা একদিকে পারিবারিক বন্ধনকে করেছে শীতল, অন্যদিকে দায়িত্বচেতনা থেকে দিয়েছে মুক্তি। কিন্তু এই দায়মুক্তি নেতিবাচক; কারণ পরিবার-বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রেম-প্রীতি-মমতা হারিয়ে লাভ করে নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা। প্রেমবিচ্ছিন্ন, পরিবার-বিচ্ছিন্ন এইসব জড়-মানুষ সম্পর্কে আলোচ্য 'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতার শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিতে কবি বলেছেন:

> 'আমি নই পুরুরবা হে উর্বশী'
> মোটরে আর বারে
> আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে
> কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
> তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে
> বাঘের চোখের মতো।[৮]

উপর্যুক্ত কবিতাংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কবির কাব্যচৈতন্যে স্থান লাভ করেছে *ঋগ্‌বেদ*-এ বর্ণিত উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনি। একদা ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে রাজা পুরুরবার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলে, উর্বশীর নৃত্যের তাল ভুল হয়ে যায়। এর ফলে ইন্দ্র-শাপে উর্বশীকে মর্ত্যে বসবাস করতে হয়। কিন্তু মর্ত্যলোকে এসেও তিনি পুরুরবার স্ত্রী হতে চান। তখন কিছু শর্তে তাঁদের বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। অথচ গন্ধর্বরা ক্রমে স্বর্গলোকে উর্বশীর অভাব অনুভব করতে শুরু করে। তখন কৌশলে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। এর ফলে উর্বশী শাপমুক্ত হলেন ঠিকই, তবে পুরুরবার জীবন শোকে-দুঃখে-বেদনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। পরিশেষে প্রেমিক পুরুরবা গন্ধর্বদের বিধান[৯] মেনে নিয়ে তাঁদের ভালোবাসার বন্ধনকে চিরস্থায়ী করেন। এছাড়া মহাকবি কালিদাসে *বিক্রম-উর্বশী* নাটকেও এই দুটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। যেখানেও এই দুজনার প্রেমের সমাপ্তি ঘটেছে মিলনে।[১০] কবি সমর সেন এই মিলনতৃষ্ণাকে চেতনপ্রত্যয়ে রেখে বলেছেন, 'আমি নই পুরুরবা হে উর্বশী'। অর্থাৎ তাঁর প্রেম এতোটা গভীর নয়, কারণ আধুনিক মানুষের প্রেম কলোনিশাসিত, যা পুঁজিবাদের শোষণে পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পণ্যে। দাম্পত্য-প্রেমে তাই তো দেখা দিয়েছে সন্দেহ, অনাস্থা ও গভীর অবিশ্বাস। সেই কারণে কবি বাণিজ্যিক প্রেমের চিত্রায়ণে ব্যবহার করছেন 'কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম' উক্তিটি। পুরুরবা না হতে পারার ব্যর্থতায় কাতর কবি প্রেম-বিচ্ছিন্ন, বাৎসল্য-প্রেম বিচ্ছিন্ন মানুষকে জড় মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান। যার সম্মুখে কেবল 'শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো'। সুতরাং এখানে সামাজিক মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ নির্বাপিত হয়েছে বাণিজ্যিক মূল্যচেতনায়। সনাতন সংসারের মৃত্যু ঘটে বারবণিতার সৌন্দর্য লেহনের নানা মাত্রায়। এক্ষেত্রে সমর সেনের 'ভোরের কলকাতা' ও 'একটি বেকার প্রেমিক' কবিতা দুটির পঙ্‌ক্তিসমূহ স্মরণযোগ্য:

ক. রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে
সূর্যের অলস উত্তাপে,
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো।
কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে
অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।[১১]

খ. চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি–
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো-বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।[১২]

এখানে 'রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে' পঙ্‌ক্তিটি আমরা 'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে খুঁজে পাচ্ছি। যেখানে আসলে নিরক্ত মহানগরীর বিবর্ণতা ও বিপন্নতার দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন কবি। এর সত্যতা পাওয়া যায়– 'কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ' পঙ্‌ক্তিতে 'ধূসর' এবং 'অশ্লীল' শব্দদ্বয়-এর ব্যবহারে। কারণ নাগরিক মানুষের শান্তি, তৃপ্তি ও প্রেম আস্বাদনের একটিইমাত্র অবলম্বন হয়েছে গণিকার সান্নিধ্য। কিন্তু গণিকা কী শান্তি দিতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবও মিলে যায়– 'পিচের পথে/ অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ' দেখার পরে। মহানগরের এই অনাত্মীয়ে ঘেরা বিবর্ণ ভুবনে গণিকা শান্তি-সুখের দিবাস্বপ্ন দেখাতে পারে, কিন্তু জীবনের মহত্তম মুক্তি দিতে পারে না। সেই কারণে ঘরে

কিংবা বাহিরে কোথাও সুখ নেই। সাংসারিক মানুষের পক্ষে এই বিনাশী ও একঘেয়ে জীবন থেকে পালাবারও পথ নেই। চলছে মদ, নেশা, মাদক ও নারীর পেছনে অঢেল আর্থিক অপচয়। কিংবা ঘরবন্দি হয়ে চলছে নৈঃসঙ্গ্যের বীজ বপনের প্রত্যয়। কবির জীবনও তো ব্যতিক্রম কিছু নয়, তাই তো বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক পত্রে সমর সেন জানাচ্ছেন,'এখনকার আর সব খবর একরকম। দিন দিন জীবনযাত্রা একঘেয়ে হচ্ছে, বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না (পত্নীপ্রেমের জন্য নয়), কোথায় যাবো ভেবে পাই না।'[১৩] কিন্তু মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। 'খ' সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি বলতে বাধ্য হন,'হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি'। উভয় উদ্ধৃতি বাঙালি মধ্যবিত্তের চারিত্র্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই শ্রেণিটিকে কবিতায় 'মেকলের বিষবৃক্ষের ফল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর দৌড় সামান্য, কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের চরম শত্রু। মীরজাফরী রয়েছে এঁদের রক্তস্রোতে। এই শ্রেণির অনেকেই যাঁরা মার্কসবাদে যাত্রা সূচনা করেছেন, তাঁরা যাত্রা সমাপ্ত করেছে ধর্মকেন্দ্রিক জীবন-প্রত্যয়ে। আবার অনেকে করেছে পলায়ন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীর আশ্রমে আসন পেতেছেন। কবি সমর সেনের পিতা অধ্যাপক অরুণ সেন প্রবল মার্কসবাদী হিসেবে যাত্রা শুরু করে, অবশেষে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী মানুষ 'সমর সেন এই দুই পথের কোনোটিতেই যান নি। কেননা এ তাঁর জানা ছিল যে, ও দু'টির কোনোটিই পথ নয়। যতই প্রশস্ত হোক, অন্ধগলি মাত্র। তিনি চেয়েছেন গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিষবৃক্ষের নয় কেবল, ভূমিরও আমূল সংস্কার।'[১৪] তাই সমকালের সমস্ত ক্ষতিকর তৎপরতাকে ক্ষমাহীনভাবে উপস্থাপন করেছেন সাংবাদিকতায় ও সাহিত্যে। 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতায় নিজের জাতিসত্তা নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন,'আমরা বাঙালি, মীরজাফরী অতীত, মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত/ বিষবৃক্ষের ফল।' এখানে কবি বক্তব্য-প্রধান এবং বক্তব্য-সৃজনের প্রত্যয়নিষ্ঠায়। এই কবিতার সমস্ত পঙ্‌ক্তিমালায় কবির নিকট একমাত্র সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব পালনই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির অন্যান্য পঙ্‌ক্তিসমূহে এই বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এভাবে:

> মীরজাফরী বদরক্ত আবার অন্তঃশীলা
> পাতি কেরানির ঘরে, আনাচে-কানাচে অনেক সংসার
> বেনিয়ার গদিতে, অহিংসার পরম আস্তানায়।
> আমাদের বাগানে বাড়ে ফণিমনসার ঝাড়
> সঙ্গোপনে আয়োজন চলে মনসার পূজার।[১৫]

লর্ড মেকলের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য: We must at present do our best to form a class of person, India in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals in intellect.[১৬] উপর্যুক্ত উক্তিতে তিনি একটি বিশেষ ইংরেজি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সৃষ্টির কথা বলেছেন। মেকল বিরচিত এই প্রক্রিয়ায় সৃজিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি জন্মসূত্র থেকেই স্বদেশ-স্বজাতি বিচ্ছিন্ন। যার ফলে এদের দ্বারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শাসন-শোষণের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পেরেছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের এই শ্রেণি থেকেই তারা সংগ্রহ করেছে বুদ্ধিজীবী 'লিয়াজোঁ অফিসার'। যারা চলনে-বলনে-মননে দেশমূল-বিচ্ছিন্ন, যার ফলে দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং কলোনিশাসনজাত বাবুসংস্কৃতি ধারক এই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা যেন 'ক্লীবের বিলাপ', ক্রন্দনেও কোনও লাভ নেই। কারণ বিদ্যা ও বিত্তের যে বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, তাতে মানুষ ইতোমধ্যেই হয়ে পড়েছে পরিবার-সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন, ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন ও গভীরভাবে মানসিক-বিচ্ছিন্ন। কবি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আকুল আর্তি চিত্রিত করেছেন '২২ শে জুন ১৯৪৪' কবিতায়:

কলনির দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ!
ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ?
ময়দানের মাটিতে গোধূলির ছাপ
স্তব্ধ চিল, থেমে গেছে চড়ুয়ের নাচ।
অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে
কফির মলিন রঙ আমার অন্তরে।
কূপের মণ্ডূক আমি, ঘুমে শুনি কালের প্রপাত।[১৭]

কলোনিশাসন, বাবুসংস্কৃতি ও মধ্যবিত্ত অভিজাত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণির মতো পুঁজিবাদী শোষণও সমাজদেহ গ্রাস করেছে গলগণ্ডের মতো। কারণ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে ভেঙ্গে গেছে একান্নবর্তী পরিবারের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়। রক্ত-সম্পর্কের আপনজন যেমন দূরে চলে গেছে, ঠিক তেমনই আর্থিক সংকটের কারণে পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষের কাছে হয়ে গেছে দুঃসহ বোঝা। এই পরিস্থিতিতে সে একা থাকতে আনন্দ পায়। সমাজের অধিবাসী হয়েও সমাজের জন্য তাঁর কোনও দায় নেই। ঘরের কোণে সে সময় কাটায় অর্থহীন, অসঙ্গত ভাবনা-চিন্তায়। যার ফলে সনাতন প্রেম-বন্ধনে ধ্বস নামে। প্রেমচেতনা থেকে সনাতন দায়িত্বজ্ঞান মুছে যায়, আর শরীরী প্রেম পায় গুরুত্ব। কারণ প্রেম হয়ে উঠেছে পণ্যের সমার্থক। ক্রমে মানুষ পরিবার-সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের সবচেয়ে জটিল সংকটের মুখোমুখি হয়। অবশিষ্ট থাকে সমাজবিচ্ছিন্ন একাকী মানুষ, যে প্রকৃত-অর্থে বিচ্ছিন্ন, নিরাশ, ছিন্নমূল, জীবন-পলাতক ও নিঃসঙ্গ। কবি বলেছেন:

নিঃসঙ্গ, শেষ মিনারে
সূর্যপূজারীর শবের উপরে যেমন,
শূন্য থেকে আজ
একচক্ষু, ছিন্নপাখা জিজ্ঞাসার পাখি
নামে, শুধু নামে।
পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই,
চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন।[১৮]

এভাবে ক্রমে পরিবার ও সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষটি ঈশ্বর থেকেও বিযুক্ত হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসের এই শিথিলতা প্রস্তুত হয় ঠিক তখন, যখন এই জ্ঞান অর্জিত হয় যে ঈশ্বরও তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। সমর সেন সে-কারণে স্রষ্টাকে নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। আসলে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সমাজের ঐক্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। একদিকে সমাজের সার্বিক অবক্ষয়, অন্যদিকে মহাযুদ্ধের বৈনাশিকতা– মানব-অস্তিত্ব ডুবে যায় বিপন্নতার অতলে। কিন্তু এই দশকেই পুঁজিবাদ, মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতা ও কলোনিশাসন এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উত্থান ঘটে। এর ফলে বাংলা কবিতায় প্রগতিচেতনার উদ্ভব ঘটে, যা জীবনবোধে নতুন মাত্রা সঞ্চার করে। সমর সেন সেই বাণীমন্ত্রের ধারকরূপে কাব্যচর্চা করেছেন। তাঁর কবিতায় সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতার সংক্রমণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মূলত প্রগতির কবি। মার্কসবাদী চেতনার আদলে পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্র থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন। 'প্রগতিশীলতার ধারায় কাব্য সৃষ্টি করেও কাব্যক্ষেত্রে প্রগতি-সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী কবিদের এবং মার্ক্সীয় লেবাসি রাজনীতিকদের তীব্র কটাক্ষ করতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নি।'[১৯] নিজের মধ্যবিত্ত কাপুরুষতাকেও প্রশ্রয় দেন নি, যার ফলে মধ্যবিত্ত-অসাধুতা ও লোক-দেখানো মানসিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন সহজে। আর সমাজ-পরিবর্তনের প্রত্যয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রগতি-চিন্তনের প্রতীকরূপে। এভাবে প্রকৃত-অর্থেই বাংলা কবিতায় এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩.

চল্লিশের দশকে সাম্যবাদী চেনাঋদ্ধ এক স্বতন্ত্র কাব্য-চারিত্র্য ও রাজনৈতিক-প্রত্যয় নিয়ে বাংলা কবিতার জগতে আর্বিভাব ঘটে কবি সমর সেনের। রোমান্টিকতার বিপরীতে নিজেকে মার্কসিস্ট হিসেবে ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি। নিজের সম্পর্কে তাঁর সদর্প ঘোষণায় আমরা পাই, তিনি কলোনিশাসিত বাবুসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। আবার একই সঙ্গে প্রগতি-চেতনায় আস্থাশীল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি অধিকতর রাজনীতিমুখী হন এবং এ-সময় তিনি'মার্কসবাদী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য বক্তৃতা দেয়ায় তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। তিনি ১৯৩৮ সালে *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের* দ্বিতীয় সম্মেলনে 'In Defence of the Decadents' শীর্ষনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ-প্রবন্ধ তুমুল সমালোচনা ও বির্তকের সম্মুখীন হয়। উগ্র মার্কসবাদী মহলে তীব্র বির্তক সৃষ্টি হয়। বিরূপ সমালোচনা, বিতর্ক ও আপত্তির কারণে ''অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা'' শীর্ষনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের 'অগ্রণী' পত্রিকায় ২য় বর্ষের ৫ম সংখ্যায়। এ-পত্রিকারই দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় সরোজ কুমার দত্ত সমর সেন প্রসঙ্গে আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করে লেখেন :

> শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর [বিপ্লবীশ্রেণির] প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবীশ্রেণীর [বিপ্লবীশ্রেণির]প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্য কিংবা কাব্য নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল।[২০]

সমর সেন জানান, 'In Defence of the Decadents'-এ তিনি নিজেকে বিপ্লবী হিসেবে উপস্থাপন করেন নি। এই প্রবন্ধে প্রকৃত-প্রস্তাবে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। বিগত দশ বছরের বাংলা কবিতার উন্নতিরেখার দিকে পাঠকদৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা করেছেন। এ-প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য,'আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে 'বিপ্লবী' বিশেষণ একবারও ব্যবহৃত হয়নি, শুধু বলা হয়েছে যে গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নতি এবং বিপ্লব আশা করি এক কথা নয়।'[২১] আসলে তৎকালীন মার্কসবাদী দর্শনে গোঁড়া বিশ্বাসীরা প্রগতি বলতে কৃষক কিংবা শ্রমিক-শ্রেণির পক্ষে আবেগতাড়িত রচনাকে বুঝতেন। কবি নিজস্ব অভিমত উপস্থাপন করতে গিয়ে, নানাবিধ সমালোচনাতে বিচলিত হয়েছিলেন। সেজন্য এই আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টা। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণি-বৈশিষ্ট্যই নয়, মার্কসবাদীদের বিরোধিতা ও সমালোচনা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে দেয়। কারণ, কবিতা-দেহে রাজনৈতিক খবরদারি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেও কাব্যের দেহশ্রী ও শৃঙ্খলাতে দলীয় অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপাতি তিনি নন। সমর সেন আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখেছেন :

> সমালোচকের কী-কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিংবা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; এ নিদারুণ জুয়াচুরির জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করেছেন। তাঁর এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করিনি, উপরন্তু কর্মভীরু পলাতক, আধা-বাস্তব-আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রুপ করে এসেছি।[২২]

সমর সেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭) উৎসর্গ করেছেন কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক মোজাফর আহ্‌মেদ[২৩]কে। বই প্রকাশের জন্য বিক্রি করেছিলেন স্বর্ণপদক। নিজের পড়ালেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: 'আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ– ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম।'[২৪] সক্রিয় রাজনীতি বলতে '১৯৩৭এ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে

প্রচারে যান আসানসোলে। সেবার এই নির্বাচনে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় জিতে যান।'[২৫] সুতরাং সমর সেন আবেগসর্বস্ব কবি নন, যদিও ভেতরে ও বাইরে তিনি একজন পরিণত মানুষ। কবিতা ও জীবনধারার যে বৈপরীত্য, তা তিনি ধীরে-ধীরে কমাতে সচেষ্ট হয়েছেন। কোনও হুজুগে মেতে, কিংবা কোনও বিষয়ে তাড়িত হয়ে কাব্যচর্চা করেন নি। নিজস্বতা রক্ষা করেছেন, কিন্তু এক রকমের লেখা লেখেননি। অনেকে যেমন নিজের একটা ধারা দাঁড় করাতে চায়, তিনি তেমনটা করেননি। এ-প্রসঙ্গে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) সমর সেনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন:

> সমরের লেখা পড়ে প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, হুজুগের ধাক্কায় তৈরি কবি এ নয়। চমকে দেবার চেষ্টা নেই, নিজস্বতা আছে, কোনো প্রলোভনে যেন কখনো সে বিচ্যুত হবে না। এক রকমের লেখা ও কোনো সময় লেখেনি। কিছু লিখে নাম হয়ে গেলে যেমন অনেকে সেটাকেই একটা ধারা হিসেবে দাঁড় করাতে চায়– সেরকম ও করেনি। সব সময়ই নতুন পথ খুঁজেছে।[২৬]

সুতরাং কবি সমর সেন সাম্যবাদী মানসিকতাকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানকরাসহ সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। সমর সেন এ-প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন সহজাত সতেজ উক্তিতে:

> রাজনীতি সংক্রান্ত সভাসমিতিতে যেতাম মাঝে মাঝে। কোন পার্টিতে কখনো যোগ দেইনি ('অংশগ্রহণ' করিনি), কিন্তু আলোচক্রে বাগবিতণ্ডায় শ্রোতা হিসেবে থাকতাম। তিরিশের শেষের বছরকটিতে সাহিত্য ও রাজনীতিরএকটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে, প্রগতি বা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট। প্রকাশ্যে রচনা পাঠ বা বক্তৃতা করা আমার একেবারে আসতো না– অবশ্য নীরব বিপ্লবে বিশ্বাস তার কারণ নয়। ছোট ছোট আড্ডায় সহজ স্বচ্ছন্দবোধ করতাম।[২৭]

সমর সেনের কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সমাজের অবক্ষয় তাড়িত যুবক-হৃদয়ের প্রেম-তৃষ্ণা ও ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসকে রোমান্টিক প্রবণতা বলে অভিযুক্ত করেছেন। যদিও সমর সেন সর্বদাই নিজেকে মার্কসিস্ট বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি '২২ শে জুন' কবিতাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে একজন গতানুগতিক, 'একঘেয়ে' ও 'বেদ উপনিষদের বুলি' আওড়ানো রোমান্টিক কবির সাথে নিজের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে কবির উক্তি:

> আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট
> অনেকে জিজ্ঞেস করে: গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
> তোমার তফাতটা কী? তফাতটা এই:
> বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
> অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
> একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন;
> কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
> দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
> বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
> ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
> নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।[২৮]

এখানে কবির নিজের প্রসঙ্গে বলা, 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট' কথাটির মাধ্যমে আসলে নিজের জাত চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ আধুনিক সাহিত্যে রোমান্টিকতা ভাবালুতার নামান্তর। তবে আরও একটু বিশদভাবে বললে বলতে হয়, 'মার্ক্সিস্টের সঙ্গে রোমান্টিকের যে বিবাদ এই কবিতায় ব্যক্ত, তা মূলত শুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব বৈদিক দর্শনের সাথে সমকালীন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধের

সূত্র ধরেই উপস্থিত, এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বহিরঙ্গটি উন্মোচন করলেই সমর সেনের 'প্রতি-রোমান্টিক' সাম্যবাদী দর্শনের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। সচেতনভাবে, অনেকটা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো, তিনি রোমান্টিকতা বর্জন করেছেন– আবেগ, উৎসাহ, প্রেরণা ও কল্পনাকে বাস্তবতার বিভিন্ন অনুশাসনে দমিত ও শৃঙ্খলিত করেছেন।'[২৯] কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়! বামপন্থি কিংবা মার্কসিস্ট কবিরা কী সর্বদাই কবি-কল্পনা বা রোমান্টিক ভাবালুতার বিরোধী? সমর সেন নিজেও তো অসাধারণ কল্পনা-প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কবিতা অসাধারণ মানস-প্রবণতা ও স্বপ্ন-কল্পনার ধারক। রবীন্দ্রনাথের সাথে তার পার্থক্য কতটুকু? যদিও কবি নিজেই উপরিউক্ত কবিতাংশে বলেছেন, 'তফাতটা এই:/বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,/ অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়/ একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন।' আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যে কল্পনা-মনীষার পরিচয় পাই, তা থেকে সমর সেনের অবস্থান বহু যোজন দূরে হলেও তো তিনি সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। প্রথম পার্থক্য চোখে পড়ে তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে, যখন এই শুদ্ধতম কবি নিজস্ব-স্বতন্ত্র-শক্তিমান কাব্যরীতি গড়ে তুলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যধারায় অবগাহন করতে বাধ্য হলেন। তাই তো জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হতাশা ও বাস্তববোধ, আশা ও স্বপ্ন-কল্পনা সহাবস্থানের পথ সন্ধান করেছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ কর্তৃক সৃজিত গদ্যকবিতার রীতিপদ্ধতি থেকে নতুন ও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করলেন। *খোলাচিঠি* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'খোলাচিঠি'-তো আমরা লেনিনের একটি উক্তি সন্নিবেশিত দেখতে পাই, তা হল, 'I support Henderson with my vote as the rope supports a man who is being hanged-Lenin.' সমর সেনের রাজনৈতিক-চৈতন্য বিশ্লেষণে এই উক্তিটির মর্মার্থ উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে লেনিন বলতে চাইছেন, পুঁজিবাদের পতন ও সম্যবাদের প্রসারের লক্ষ্যে কমিউনিস্টরা প্রয়োজনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করে চলবে। তবে এর মানে এই নয় যে, এই নীতির আলোকে সাম্যবাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ থাকবে। সুতরাং প্রাথমিক আত্মপ্রকাশে তাঁর কবিতায় ইন্দ্রীয়ঘনত্বের ছাপ কিংবা ব্যক্তিমনের সহজাত কামনা-বাসনার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু রোমান্টিক আত্মনিমজ্জনের ঘোলাটে দৃষ্টিকোণে তো সাম্যশক্তির কথা প্রকাশ করা যায় না। আর চল্লিশের দশকে দেশকালচেতনা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মনোজগতে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গণমুখী শিল্পভাবনার সূচনা ঘটায়। আকাল, মহামারী, অবক্ষয়, মন্বন্তর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশ পরিণত হয় মৃত্যু-উপত্যকায়। একদিকে খাদ্যের অভাবে যেমন মানুষের মৃত্যু ঘটছে, অন্যদিকে পরিপুষ্ট হচ্ছে মজুতদার ও কালোবাজারী। এই দুঃসহ পরিস্থিতিকে কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে, তাই বর্গিরা বাড়ে
> . . . শুধু দেখি
> কুৎসিত মানুষ আর রোগাক্রান্ত নারী
> বক্র, গলিত নাসা
> উৎসবের উচ্ছিষ্ট তন্ন-তন্ন খুঁজে
> জঞ্জালজীবী শঙ্কিত কুকুর দিন রাত্রি ঘোরে
> যেন কার ছিন্নভিন্ন শবদেহ সন্ধানে।[৩০]

সুতরাং কবিকে প্রকাশভঙ্গীর ভিন্ন পথরেখা অনুসন্ধান করতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এই চরম অমানবিক পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। গঠন করে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি', যার মধ্য দিয়ে মানবসৃষ্ট এই মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় প্রগতিবাদীরা। আমরা জানি, ১৯৪৩ সালে খাদ্যঘটতি ছিল মাত্র তিন সপ্তাহব্যাপী। মূলত তা ঘটে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণে যে যুদ্ধনির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে তার কারণে। জাপানের কাছে বার্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আমদানি কঠিন হয়ে যায়। তখন ব্রিটিশ সরকার সিংহলে মিত্রবাহিনীর রসদ জোগানোর জন্য বাংলা থেকে চাল রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।[৩১] ফলে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে দেখা দেয় খাদ্য-ঘটতি এবং অপরিহার্যভাবে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ ও বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সমাজ-সংসার, নগর-বন্দর, গ্রাম-শহর সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আর পুঁজিবাদে আস্থাশীল মুষ্টিমেয় মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের বিশাল একটি শ্রেণিকে। লর্ড মেকলের বিষবৃক্ষে জন্ম নেয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি তার ক্রীড়নকমাত্র, সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষমতা তার নেই। তাই কবি স্বপ্ন দেখলেন– এই সমাজকে ভেঙ্গে মেহনতী, পরিশ্রমী ও সংগ্রামশীল মানুষের সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কৃষক-শ্রমিক-তাঁতি-কামার-কুমোর বিভিন্ন পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস, প্রতিরোধ-আন্দোলন ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল :

যারা মাঠে খাটে
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা
তাদের মিতালি খুঁজি।[৩২]

ইতিহাস-পাঠের আলোকে বলা যায়, প্রতিটি সমাজেরই একসময় উত্থান ঘটেছে ও রূপান্তর হয়েছে। আমরা জানি, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্রানুসারে পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্ম হবে। আমরা জানি, আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ পুর-সমাজ (Civil Society) এবং রাষ্ট্রীয় সমাজ-ব্যবস্থা (Political Society) বা রাষ্ট্রের অধীন। আর রাষ্ট্র বৃহত্তর পুর-সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা ব্যক্তি-পরিবার, জনগণ, বিবিধ শ্রেণি-পেশার মানুষ দ্বারা গঠিত। এর সাথে যুক্ত রয়েছে সামাজিক-মানুষসৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের দ্যোতক নানা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো– 'রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র', 'রাজনৈতিক দল', 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান', 'জাতিগোষ্ঠী', 'পারিবারিক-বৃত্ত' ইত্যাদি, যা বিমূর্ত আকার পরিগ্রহ করে। এক পর্যায়ে সেগুলো স্বতন্ত্র-সত্তা অর্জন করে মানুষকেই দাসে পরিণত করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' বা রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তা সমগ্র সমাজের নিয়ামক ও নিপীড়ক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। তখন পুর-সমাজ (Civil Society)-এর সদস্য হিসেবে ব্যক্তির যে স্বতন্ত্র স্বাধীনসত্তা থাকে তা হারিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত সত্তায় পরিণত হয়। এই খণ্ডিত মানুষের সাথে সমাজস্থ অন্য মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে পড়ে পণ্যের সাথে মানুষের সম্পর্কের সমার্থক। কেননা মানুষ উক্ত পণ্যের নিয়ন্ত্রক না হয়ে, উৎপাদিত পণ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত মজুরী সে ব্যয় করে নিজের উৎপাদিত পণ্যের ভগ্নাংশের উপর অধিকার পেতে। কবি সমর সেন এই শ্রমের উপযুক্ত বিনিময় দিতে চান। *খোলা চিঠি* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা,'খোলা চিঠি' কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় আমরা সেই উদাহরণ খুঁজে পাই :

যারা লাঙলে তিলেতিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।
দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে,
তারা বলে, দুনিয়ার কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।[৩৩]

সমর সেন কবিতায় শ্রেণি-চৈতন্যের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এভাবে সাম্যবাদের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। তাই পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্রের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক মুক্তির দিকে নিবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ পুঁজিবাদী শোষণ-নিগ্রহ ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অসম্ভব। এর ফলে এই ধরনের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি যেমন অনাস্থা পোষণ করেছেন, আবার ঠিক তেমনভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মুখোশ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন।

৪.

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সমর সেনের যে কবিচারিত্র্য আমরা অনুধাবন করি তা মধ্যবিত্তের অনতিক্রান্ত বৃত্তে বন্দী, তা একদিকে মার্কসবাদী রাজনৈতিক-দর্শনে অবিচল প্রত্যয়ে জাগ্রত, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়-চিত্র অঙ্কনে নিবেদিত। আবার কট্টর মার্কসবাদীরা প্রগতি বলতে কৃষক-শ্রমিক-মজুর শ্রেণির পক্ষে যে আবেগতাড়িত রচনাকে বোঝাতে চাইতেন, তা তিনি অনুসরণ করেননি। নিজস্ব-পন্থায় স্বপ্ন দেখেছেন– অবক্ষয়-শোষণ, বণিকতন্ত্র-পুঁজিবাদ প্রভৃতি পতনের মাধ্যমে মানবিক-মহাসমাজ গড়ে তুলবার, কিন্তু সেখানে ঠাঁই পায়নি জীবন্মুক্তির অলীক মায়ালোক। কারণ তিনি চেয়েছেন বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা যেমন সামন্তবাদকে মুছে দিয়েছে, তেমনিভাবে মার্কসীয় চেতনার আলোকে হিংস্র ও ঘৃণ্য পুঁজিবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে সমাপ্ত হবে সকল শোষণ ও বঞ্চনা। আসলে সমর সেন এক নন্দনময় মননবিশ্বকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যেখানে রয়েছে এক শোষণমুক্ত এবং গতিমুখর জীবনরূপ ও তার পুনরুদ্ধারের স্বপ্নময়তা। সেখানে একদিকে যেমন রয়েছে সমাজ-সমস্যার জটমুক্ত সহজ-প্রবাহ, অন্যদিকে ঠিক তেমনই আছে মানবতার মুক্তির বিপুল স্ফূর্তি। তাই তো তাঁর এই স্থিত কবিচিত্তে নেই কোনো রহস্যবিধুর প্রতীকবিশ্ব কিংবা অতীন্দ্রিয়লোক, আছে বস্তুবিশ্বচেতন বাস্তবতা– যে কাব্যপৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছে আলো-বর্ণের মিলনবিন্দু।

তথ্যনির্দেশ

[১] জীবনানন্দ দাশ, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র* (ঢাকা : বইপত্র, ৪র্থ খণ্ড, ২০০০), পৃ. ২৯

[২] Sudhi Pradhan (ed), *Marxist Cultural Movement in India* (Calcutta : Vol.1, 2nd edn., 1985), p. 75

[৩] সৌভিক রেজা, 'কবি সমর সেন ও তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব', *সমর সেন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি* (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.), (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস্, ২০১৭), পৃ. ২০৫

[৪] শঙ্খ ঘোষ,'নিঃশব্দতার ছন্দ', অনুষ্টুপ সমর সেন শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা (অনিল আচার্য সম্পা.), (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ৫১ বর্ষ, ২০১৬), পৃ. ১৬৪

[৫] অনীক মাহমুদ, 'সাম্যের সংগ্রামে দুই পদাতিক: সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়', *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা* (ঢাকা : অক্ষর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সং., ২০১৪), পৃ. ২১১

[৬] সমর সেন, 'পত্র-৮', *অপ্রকাশিত অগ্রন্থিত সমর সেন-১*(পুলক চন্দ সম্পা.), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫), পৃ. ১৬৭

[৭] সমর সেন, 'স্বর্গ হতে বিদায়', *কয়েকটি কবিতা* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ৪৯

[৮] তদেব, পৃ. ৫০

[৯] সুধীর সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান* (কলকাতা : এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., দশম সং., ১৪১৫), পৃ. ৫২

[১০] তদেব, পৃ. ৫৩

[১১] সমর সেন, 'ভোরের কলকাতা', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

[১২] সমর সেন, 'একটি বেকার প্রেমিক', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

[১৩] সমর সেন, 'পত্র-৩৫', *অপ্রকাশিত অগ্রন্থিত সমর সেন-১* (পুলক চন্দ সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

[১৪] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'মেকলের বিষবৃক্ষের ফল', *সমর সেন* (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.), (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৩৭

[১৫] সমর সেন, 'পঞ্চম বাহিনী', *নানাকথা* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ৪৫

[১৬] H.Woodrow, *Macaulay's Minutes on Education in India* (Calcutta : Co.'s Press, 1862), p. 115 উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮), পৃ. ৪০

[১৭] সমর সেন, '২২ শে জুন ১৯৪৪', *তিন পুরুষ* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ৩৩

[১৮] সমর সেন, 'গ্রহণ', *গ্রহণ* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ৩৩

[১৯] মুনীর সিরাজ, 'সমর সেন : প্রগতি চেতনার অগ্রজ কবি', *সমর সেন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি* (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

[২০] সমর সেন, "অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা", *গ্রহণ* (পরিশিষ্ঠঃ প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

[২১] তদেব, পৃ. ৫৩

[২২] তদেব, পৃ. ৫১

[২৩] সমর সেন, 'উৎসর্গপত্র', *কয়েকটি কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

[২৪] সমর সেন, *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক* (সম্পাদক : পুলক চন্দ), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সং., ১৯৯১), পৃ. ২৯

[২৫] বৃন্দাবন কর্মকার, *সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন* (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২০০৭), পৃ. ৭৮

[২৬] প্রেমেন্দ্র মিত্র,'সমর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা', *অনুষ্টুপ সমর সেন শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা* (অনিল আচার্য সম্পাদিত), পূর্বোক্তি, পৃ. ৮

[২৭] তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬

[২৮] সমর সেন, '২২ শে জুন', *সমর সেনের কবিতা* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ৩য় মু., ২০১৬), পৃ. ১২৫

[২৯] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'সমর সেনের কবিতা', *সমর সেন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি* (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.), পূর্বেক্তি, পৃ. ৭৯

[৩০] সমর সেন, 'সারণের গান', *নানাকথা* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ২৮

[৩১] রজনীপাম দত্ত, দুর্ভিক্ষের কারণ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন এই বলে– 'The famine was a 'manmade famine' (দ্রঃ India Today:) দ্রঃ বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের কার্যকরণ সন্ধানে', 'সংস্কৃতি ও সমাজ', ১ম বর্ষ, ১৯৮৩, ঢাকা। দ্রঃ আহমেদ মাওলা, 'সমর সেন:কবিমানস ও সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ', *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৪৪

[৩২] তদেব, পৃ.২৬

[৩৩] সমর সেন, 'খোলা চিঠি', *খোলা চিঠি* (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ৩য় সং., ২০১২), পৃ. ১৫